ঊষসী

মাসিক মুখপত্র
শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা, পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০১৭ মূল্য ৩ টাকা

যদি কোন সৎকর্মের পক্ষে থাকে একটিমাত্রও জীব যার বিশ্বাস অক্ষত, তবে তা কখনও ব্যর্থ হয় না।

—শ্রীঅরবিন্দ
(চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি, পৃ ৭৮)

Sri Aurobindo's action

সম্পাদকীয় দপ্তর —

চলভাষ ঃ ৯০৩৮৫৫৬৫০৯ / ৯৮৩১৭১৫১৩৪
E-mail : sriaurobindosactionwestbengal@gmail.com

স্বদেশ আত্মার আবিষ্কার

—শ্রীঅরবিন্দ

ব্যক্তি কেবলমাত্র নশ্বর দেহধারী জীব নয়, মন ও শরীরের এমন একটি রূপ নয় যা একত্র সম্মিলিত হয় ও বিলীন হয়—সে একটি সত্তা, শাশ্বত সত্যের একটি জীবন্ত শক্তি, একটি আত্মা যা নিজেকে প্রকাশিত করছে। একইভাবে সমাজ, গোষ্ঠী বা নেশনের (জাতির বা স্বদেশের) প্রাথমিক নীতি ও মৌলিক উদ্দেশ্য তার আপন আত্মচরিতার্থতা সাধন করা; তাদের প্রত্যেকে চেষ্টা করে চলেছে (আর তাইতো উচিত) নিজেকে খুঁজে পেতে, নিজের ভিতরে তার আপন সত্তার ধর্ম ও শক্তির বিষয়ে অবহিত হতে এবং যত পরিপূর্ণভাবে সম্ভব তাকে চরিতার্থ করতে, তার সমস্ত সম্ভাবনাগুলি পরিপূর্ণ করতে, নিজেকে প্রকাশ করার জীবন যাপন করতে। কারণটি একই; কারণ এও একটি সত্তা, শাশ্বত সত্যের একটি জীবন্ত শক্তি, বিশ্বগত আত্মার একটি স্বয়ম্প্রকাশ এবং তা রয়েছে তার ভিতরে বিশ্ব-আত্মার যে বিশেষ সত্যটি, শক্তিটি, ও অন্তর্নিহিত অর্থটি আছে তাকে তার নিজস্বরূপে ও তার ক্ষমতানুসারে প্রকাশ করতে ও চরিতার্থ করতে। ব্যক্তির মতনই, স্বদেশ বা সমাজের আছে একটি শরীর, একটি জৈবিক প্রাণ, একটি নৈতিক ও সৌন্দর্যবোধের বিশেষ প্রবণতা, একটি বিকাশশীল মন এবং এসব লক্ষণ ও শক্তির অন্তরালে আছে একটি আত্মা যার জন্যই এসব রয়েছে। এমনকি ব্যক্তির মতোই তারও আত্মা আছে, এ একটি গোষ্ঠী-আত্মা যা একবার তার আপন স্বতন্ত্রতা লাভ করার পর ক্রমশ আত্ম-সচেতন হতে বাধ্য এবং যতই তার সমষ্টিগত কার্যাবলি, মানসিকতা ও তার প্রাণজ আত্ম-প্রকাশশীল জীবন বিকশিত করবে ততই আরও বেশি পূর্ণরূপে নিজেকে খুঁজে পাবে।...

যখন আমরা বুঝি যে দেশের জমি কেবল শরীরের খোলস মাত্র, যদিও সত্যি অতি জীবন্ত একটি খোলস এবং নেশনের উপর এর প্রভাব অতি সক্রিয়, যখন আমরা বোধ করতে আরম্ভ করি যে এর সত্যিকার দেহ হল সেইসব পুরুষ ও নারী যাদের নিয়ে নেশনটি সৃষ্ট, যে দেহ সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু তবু সকল সময়ে একই রকম বলে মনে হয় ঠিক যেমন ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তখনই আমরা প্রকৃত বিষয়ীগত গোষ্ঠীচেতনার পথে রওনা হয়েছি। কারণ তখনই আমাদের এই বোধ জন্মাবার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে যে সমাজের শারীর সত্তাটিও একটি বিষয়ীগত শক্তিবিশেষ এবং কেবল একটি বিষয়গত অস্তিত্বমাত্র নয়। আর শুধু তাই নয়, তার আন্তর সত্তায় তা একটি বিশালতর শক্তি, একটি বিশাল সমষ্টিগত আত্মা যেখানে আত্মিক জীবনের সকল সম্ভাবনা ও তার সঙ্গে সকল বিপদই আছে।

শ্রীঅরবিন্দের 'The Human Cycle' গ্রন্থের অনু: 'মানব যুগচক্র' থেকে, অধ্যায়—'স্বদেশ আত্মার আবিষ্কার' থেকে সংকলন—স

সমতা ও শান্তির মধ্যেই শুধু জানতে পারা যায় কোন কাজটি সর্বোত্তম হবে।

—শ্রীমা, রচনাবলি ১৪শ খণ্ড, পৃ ১৩১

প্রাণ—এক বন্য ঘোড়া

—শ্রীমা

☞ শৈশব থেকেই সচেতন শিক্ষা না হলে সমূহ ক্ষতি

প্রাণকে সুপথে চালানো? নিশ্চয়ই যায়। কাজটা যদিও কঠিন, কিন্তু করা অবশ্যই যায়। আর যদি না পারা যেত তাহলে তো কোন আশাই থাকত না। তবে সাধারণত কেবল মনই যথেষ্ট নয়। আমি অমন প্রচুর লোককে জানি, যারা অতি পরিষ্কার দেখতে পায়, খুব ভালো করে বুঝতে পারে, মন দিয়ে যারা সম্পূর্ণ একমত, তারা তোমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিষয় বলতে এবং বর্ণনা করতে পারে, অন্যদের চমৎকার শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু তাদের প্রাণ নানা রকমের চালাকি করে, সে ওসবে কান দেয় না। সে বলে, ''তুমি যা খুশি বল না কেন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, আমি যেভাবে চাই, ঠিক সেই ভাবেই চলব।''

একমাত্র উপায় হল, চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। তা যদি করতে পার, তাহলে সে যে কোন কিছুকেই বদলে দিতে পারে,—এমনকি নিকৃষ্টতম অপরাধীকেও মুহূর্তের মধ্যেই বদলে দিতে পারে। এসব হল চৈত্যপুরুষের জ্যোতি যা তোমাকে অভিভূত করে ফেলে এবং যা তোমাকে সম্পূর্ণ বদলে তোমার ভিতরকে সম্পূর্ণ বাহিরে নিয়ে আসে। তারপর থেকে সবকিছু ঠিকভাবে হয়ে থাকে। হয়ত ছোটোখাটো ব্যবস্থার ব্যাপারে সামান্য কিছু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু আসলে সব ভালোভাবেই চলবে।

কিন্তু মন বড় বেশি উপদেষ্টা, সেটাই ওর স্বভাব। গির্জায় যেমন করে, সেই রকম মন তোমাকে উপদেশ দেবে, ধর্মকথা শোনাবে। প্রাণের তাতে প্রায়ই ধৈর্য থাকে না, সে কোন ভদ্রতার ধার ধারে না, সটান মনকে শুনিয়ে দেয়, ''তুই বড়ই জ্বালাতন করছিস। যা বলছিস সে সব তোর জন্যেই ভালো, কিন্তু আমার জন্যে মোটেই নয়।'' অথবা, বড় জোর, মন যেখানে সত্যিই অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় দেয়, আর প্রাণটিও বেশ খানিকটা যেখানে উঁচু দরের হয়, সেক্ষেত্রে প্রাণ বলতে পারে, ''সত্যিই, তুই আমাকে যেটা বললি, তা বড়ই সুন্দর (এমনটা কখনও কখনও ঘটে থাকে)। কিন্তু কি করি বল, আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। ওটা খুবই সুন্দর বটে, কিন্তু আমার সামর্থ্যে কুলোবে না।''

☞ অদ্ভুত জীব হল এই প্রাণ সত্তা

কিন্তু এই প্রাণ হল আবার একটি অদ্ভুত জীব। যত কিছু আবেগ, উত্তেজনার, উদ্যম উৎসাহের আধার, অবশ্য সেগুলো সবই কামনার ব্যাপার। কিন্তু, আবার সুন্দর কিছু দেখলে সে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারে, তার চেয়েও বড় কিছু, মহৎ কিছু পেলে সে তা বেশ অনুভব করতে পারে, আর সত্যিই যদি সত্তার মধ্যে, যথার্থ সুন্দর কিছু একটা প্রকাশ পেয়ে থাকে, যার মূল্য খুবই অসাধারণ, তাহলে এই প্রাণই উৎসাহে পুলকিত হয়ে

সত্যই শান্তি একান্ত প্রয়োজন—শান্তি না থাকলে সহজতম ব্যাপারও অবিলম্বে বিপুল বিভ্রাটের সৃষ্টি করে।

—ঐ

উঠতে পারে এবং তখন সে অখণ্ড শ্রদ্ধাভরে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে—সেই সঙ্গে এমনই উদারতার পরিচয় দেয়, যেটা মনের রাজ্যে অথবা দেহের রাজ্যে কোথাও মেলে না। কাজের ক্ষেত্রে এই প্রাচুর্য তার সহজাত, সেটার কারণ তার মধ্যে রয়েছে উৎসাহে মেতে ওঠার সামর্থ্য, আর তখন সে যেটা করে, তার মধ্যে নিজেকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে সমগ্রভাবে ঢেলে দিয়ে, সেটা করে। যারা বীরপুরুষ তাদের প্রাণ সর্বদাই খুব শক্তিশালী। আর প্রাণ যখন কোন কিছুর জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষ আর যুক্তি-বিচারের ধার ধারে না, সে তখন বীর যোদ্ধা হয়ে ওঠে, সে তখন সমগ্রভাবে তার কাজের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আর তখন অসাধারণ সব কাজ করতে পারে, কারণ সে হিসেবনিকেশ করে না, যুক্তি-বিচার করে না, মনে মনে বলে না, ''সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে, এমনটা করলে চলবে না, অমনটা করলে চলবে না।'' বিচক্ষণতা তার মধ্যে নেই, লোকে যাকে বলে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা, সে তাই হয়ে ওঠে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে। তাকে যদি ভালো করে চালানো যায়, তাহলে সে অতি সুমহান জমকালো কাজ করতে পারে।

রূপান্তরিত প্রাণ হল এক সর্বশক্তিমান যন্ত্র। কোন কিছু যদি অসাধারণ ভাবে সুন্দর হয়, নৈতিকতাই হোক বা স্থূল কিছুই হোক, কখনও কখনও তার দ্বারা সে নিজের স্বভাব বদলে ফেলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যখন সে পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের, কোন বিচার বিবেচনা না করে আত্ম-উৎসর্গের কোন অভিনয় দেখে, যে ধরনের বস্তু যথার্থই অতিশয় বিরল, কিন্তু যা অদ্ভুতভাবে সুন্দর, সে তখন তার দ্বারা এতখানি অভিভূত হয়ে পড়ে যে, ওই কাজ নিজে করবার জন্যে তার অন্তর আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। শুরু হয় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আর সমাপ্তি হয় আত্ম-উৎসর্গের দ্বারা।

একমাত্র একটি বস্তুতে প্রাণের বিভীষিকা জাগায়, তা হল ম্যাজম্যাজে ভাব, একঘেয়েমি, নীরস, নিষ্প্রভ, অপদার্থ জীবন। তেমন অবস্থায় পড়লে সে ঘুমিয়ে পড়ে, তামসের মধ্যে ডুবে যায়। একথা সত্যি যে, চরম উগ্রতাকেই সে পছন্দ করে, দরকার বোধ করলে সে দুর্দান্ত হতে পারে, নিষ্ঠুরতার চরমে যেতে পারে, আবার চরম উদারতা, অতিমাত্রায় সৎ স্বভাব এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে। সে চায় সর্বদাই চরম নিষ্পত্তি—হয় এসপার নয় ওসপার, ভগবান জানেন, কখন কোন্ দিকে তার মতি যায়।

☞ যা করতেই হবে

আর, এই যে প্রাণ, একে যদি অসৎ পরিবেশে রাখ, সে সেই অসৎ পরিবেশকেই নকল করবে,আর যা কিছুই কুৎসিত এবং কদর্য দুর্দান্তভাবে সেই সবই করবে। কিন্তু তাকে যদি অপূর্ব সুন্দর, উদার, বিরাট, মহৎ দিব্যবস্তুর সংসর্গে রাখ, তাহলে সে ক্ষেত্রে সে আত্মহারা হয়ে অন্য সমস্ত কিছু ভুলে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিতে পারে। সত্তার অন্য যে কোন অংশের চেয়ে সে ঢের বেশি নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে দিতে পারে, কারণ

তোমার নিজের অন্তরে শান্তি না থাকলে আর কোথাও শান্তি খুঁজে পাবে না।

—ঐ

সে হিসেব করে কাজ করে না। সে চলে তার আবেগ আর আগ্রহের বশে। তার যখন কোন কামনা জাগে, তখন তা দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, অপরের তাতে ভালো-মন্দ কি হবে, সে বিবেচনা তার নেই, তার কাছে সে সবই সমান। কিন্তু সুন্দর কিছুর কাছে সে যখন নিজেকে সমর্পণ করে, তখনও নির্বিচারে তা করে, নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দেয়, তাতে তার ভালো হবে কি মন্দ হবে তা সে জানেও না। মানুষের মধ্যে রয়েছে এমন যে একটি যন্ত্র, এ সত্যিই মহামূল্যবান।

কিন্তু প্রাণ হল যেন ঘোড়দৌড়ের জাত-ঘোড়া। সে যদি পোষ মেনে চালকের নির্দেশ অনুসারে চলে, তাহলে প্রতিটি দৌড়েই সে জিতবে, সর্বত্র সে সবার আগে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু যদি পোষা না হয়, তাহলে সবাইকে চাট্ মেরে ফেলে দিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাবে, শেষ পর্যন্ত নিজেরই হাঁটু ভাঙবে বা পিঠ জখম করবে। ঠিক এই রকমই হয়ে থাকে। জানা চাই তার মেজাজ কি রকমের। সর্বদাই সে ভালোবাসে অসাধারণ কিছু—হয় যৎপরোনাস্তি মন্দ, নয় অতুলনীয় মহৎ কিছু, কিন্তু তা একেবারে অসাধারণ হওয়া চাই। সাধারণ জীবনে সে বীতশ্রদ্ধ, সেখানে সে একেবারে নীরস নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, যেন প্রাণহীন। আর তাকে যদি একটা কোণে বন্ধ করে রেখে বলা হয়, ''এইখানে চুপটি করে বসে থাক।'' সে থাকবে বটে কিন্তু ক্রমশ যেন ঝরে পড়ছে, এমনি অবস্থা হবে, শেষ পর্যন্ত যেন মৃত অবস্থায় পরিণত হবে। তার ভিতরে তখন আর জীবন বলে কিছু থাকবে না, সে শুকিয়ে যাবে। তখন মানুষ যেটা করতে চায় সেটা করবার শক্তি আর তার থাকবে না। হয়তো তার মনে মনে সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা এবং অদ্ভুত সব কাজের অভিপ্রায় আছে, কিন্তু সে সবকে গড়ে তোলার মতন শক্তি থাকবে না।

তাই তোমাদের প্রাণটি যদি হয় খুব দুর্ধর্ষ তাহলে যেন হা-হুতাশ ক'র না, দেখবে, লাগাম যেন শক্ত হয়, এবং কষে ধরে থাকবে। তাহলেই সে ঠিক চলবে।

শ্রীমায়ের রচনাবলি, ৫ম খণ্ড, পৃ ২৫২-২৫৪। সংকলন, শিরোনাম ও উপশিরোনাম—স

সুসম্পর্ক-ভালোবাসা-বিশ্বাস : নকল ও আসল

☞ সত্যের মুখোমুখি

সেদিন শুনছিলাম একজন বাড়ির গিন্নি অপর এক প্রতিবেশীকে বলছে : 'মানুষকে ভালোবাসার থেকে কুকুর-বিড়ালকে ভালোবাসা অনেক ভালো। মানুষ বেইমান...ইত্যাদি।' মানুষ কি সত্যি কুকুর-বিড়ালকেও প্রকৃত ভালোবাসে? মানুষ নাকি ঈশ্বরকেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে। তাই কি? সত্যিই কি তাই? বোধহয় না। মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসা থেকে বেশি ভয় করে তাকে। ভয়ও করে না বোধহয়। কারণ ভয় করলে অনেক অপকর্ম, মিথ্যাচার, অনৈতিক, অসামাজিক, স্বার্থপর কাজগুলি করতো না সচরাচর। ঈশ্বর তার কাছে

শুদ্ধ মনের শান্তির চেয়ে অধিকতর শান্তি আর নেই।

—ঐ, পৃ ১৩২

একটা নিরাপত্তার বস্তু। বিপদে পড়লে তিনি রক্ষা করবেন। আর যত আমাদের চাহিদা, বাসনা তাঁর কাছে জানাবো, তিনি পূরণ করবেন। এই হলো ঈশ্বর-ভক্তি ও বিশ্বাসের আদত চেহারা সাধারণত। আবার ঈশ্বর বিশ্বাসের নামে অন্ধ গোঁড়ামি, নানা বিধি-নিষেধ, অর্থহীন আচার, না জেনে-বুঝে উপচারের বাহুল্য—এসবই ধর্মের বাস্তব চেহারা আজও। যারা এহেন ঈশ্বর বিশ্বাসী না, ধর্মীয় আচার পালন করেন না, মন্দিরে মসজিদে চার্চে যান না, তারা নাস্তিক। আর ধার্মিকেরা, ঈশ্বর বিশ্বাসীরা নিজেদের বিশ্বাসকে যখন চাপিয়ে দেয় অন্যের উপর, আর তারা সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একদিন বিদ্রোহ করে, তখন তাদের উপর কোনো সামাজিক বয়কট, কখনো অবজ্ঞা, উপহাস জোটে এখনো কোথাও কোথাও। এমনকি যদি এহেন অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসীরা সংখ্যালঘুও হয় তবুও তাদের অসহিষ্ণুতা আর ক্রোধ সামাজিক সুস্থিতি নষ্ট করছে আজও। সেখানে সাধারণ মানুষরা নীরবে সে অসহিষ্ণুতাজনিত অত্যাচার মেনে নেয়, ভয়ের ভিত্তিতে। আবার নিরীহ সাধারণ ধর্মভীরু মানুষরা ঈশ্বরকে উঁচু আসনে, ঠাকুর ঘরের মধ্যে বসিয়ে ভয়-ভীতি ভালোবাসায় (?) শ্রদ্ধায় (?) পূজা করে। আমরা জানি না ঈশ্বর কিরকম দেখতে। ঈশ্বর নাকি প্রেমময়, করুণাময়! কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস করি যখন তখন কোথায় আমাদের মধ্যে তাঁর অকৃত্রিম প্রকাশ? বরং সারাজীবন জুড়ে যা করি তার বেশিরভাগই উলটোটাই। তিনি প্রেমময়, করুণাময় অথচ আমাদের জীবনে তাঁর প্রকাশ কোথায়? ঈশ্বর কাকে বলে? ঈশ্বর উপলব্ধি কি? বিশ্বাস কি? ঈশ্বরকে ভালোবাসা মানে কি? তাঁকে কি কেউ দেখেছে? তাঁকে ভালোবাসি অথচ তাঁর এই জগৎ সৃষ্টির সবকিছুকে কি অন্তর থেকে ভালোবাসি? সে ভালোবাসা কি পক্ষপাতদুষ্ট নয়? সে ভালোবাসা কি আদৌ ভালোবাসা?

ঠিক তাই। আমরা জানি না ভালোবাসতে। জানি শুধু কিছু সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার জন্য, নিজের মনগড়া পছন্দ মতো, নিজের পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মধ্যে তাঁকে উপভোগ করতে। তাও জানি না। যদি একজন নিজের প্রত্যাশা, দাবি, পছন্দ, স্বাধীনতা প্রকাশ করতে চায়, যা কি না একান্তভাবে অপর পক্ষের পছন্দকে বিনা প্রশ্নে মানতে বাধ্য না; বরং সংসার ছাড়িয়ে বৃহতের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতে চায় তখনি সংসারের অন্যরা ক্ষুণ্ণ হয়, অশান্তি হয়। আসলে ভালোবাসা যাকে বলি তাহলো অপরকে নিজের মতো করে পেতে চাওয়া। কিন্তু অপর যখন নিজেকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে চায়, আর সেই চাওয়াতে অন্যের প্রত্যাশায়, বাসনায়, আবেগে যদি একটু ভাগ কম পড়ে ব্যাস সেখানেই সম্পর্কের অবনতি। ভালোবাসা তখন দেনা-পাওনা।

তাহলে ভালোবাসা কখন প্রকৃত ভালোবাসা, কখন তার থেকে সুসম্পর্ক, সৌহার্দ, প্রীতি আসে? ভালোবাসা যখন স্বধর্ম, আর আত্ম-বিকিরণের মতো হয়, দেওয়া, আত্মদান হয়। সেখান থেকে সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ, শৃঙ্খলা আর প্রকৃত স্বাধীনতা আসে। কিন্তু কেন এমন হয় যে আমরা নিরপেক্ষভাবে ভালোবাসতে পারি না? ঠিক এই প্রশ্ন নিয়ে

অনুকূল পরিস্থিতির মাধ্যমে নয়, পরন্তু আন্তর রূপান্তরের মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করতে হবে।

—ঐ

Declan Galbraith-এর ''Tell Me Why'' গানটি শুনতে শুনতে বড়োই বেদনা বোধ করি। সেখানে বলা হচ্ছে যে, এই আকাশ এই বিস্তৃত ভূমি সবুজ, আর laughter হলো এই বিশ্বের প্রকৃত সুর। আর তারপর আমি জেগে উঠে দেখি যে পৃথিবীর মানুষ কত তৃষিত, কত ক্ষুধার্ত! তোমরা বলো কেন এমন হবে? বলো আমাকে আমি যা দেখতে চাই তা কেন পাই না? বলো কেন? কারণ আমি বুঝতে পারি না কেন এত মানুষের এত অভাব, কেন আমরা একটু সাহায্যের হাত বাড়াই না? বলো আমাকে। সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি মানুষ হিসাবে কি করবো? আমি কি নিজে একাকী দাঁড়াবো আর সকলকে প্রমাণ দেবার জন্য বলবো : কে আমি? এই এক আমার জীবন যেখানে আমি এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে নিজে অসহায়ভাবে বৃথা সময় অপচয় করবো? বলো আমাকে, কেন এমন হবে? বলো আমাকে, কেন আমি যা চাই তা দেখি না? বলো আমাকে, কারণ আমি বুঝতে পারছি না। বলো আমাকে, বলো কেন এমন! বাঘেরা দৌড়ায় আর তাকে বন্দুক দিয়ে হত্যা করা হয়? বলো আমাকে। কেন আমরা বলি তাহলে যে আমরা যত্নবান? কেন? কেন ডলফিনরা কষ্ট পায়, চিৎকার করে? কেউ বলবে কি কেন সমুদ্র শুকিয়ে যাচ্ছে? যদি আমরা আর এই সৃষ্টিতে যা আছে তারা সবাই সমান হই? কেন আমরা দোষারোপ করি অপরকে? বলো। আমরা সকলে বন্ধু হতে পারি না? কেন কেন?

এই গান তিনি রচনা করেছেন আর একটা শিশু যখন গাইছে youtube-এ তখন ভাবছি সত্যিতো আমরা কি ভালোবাসি আমাদের এই সৃষ্টিকে, আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে? বোধহয় না। অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত ভালোবাসা নেই। তাই নেই সুসম্পর্ক। যা আছে তা কতগুলি কাজচলাগোছের নড়বড়ে স্বার্থের সম্পর্ক। ভাঙছে, রক্তাক্ত হচ্ছে, লড়াই হচ্ছে, শোষণ হচ্ছে; নানাভাবে বঞ্চিত করছি, ঠকাচ্ছি, উপেক্ষা করছি, নির্দয় হচ্ছি অপরের প্রতি। কি তবে আমরা? আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পাণ্ডিত্য কি কাজে লাগলো তবে?

প্রকৃত ভালোবাসা ত্যাগে, আত্মদানে। বলি তবে একটা কাহিনি। Katherine Hepuburn নিজের অভিজ্ঞতাটা লিখেছেন যে কাকে বলে ভালোবাসা, যে ভালোবাসা থেকে আসে ত্যাগ, সহমর্মিতা। কাহিনিটা এইরকম : তিনি যখন ছোট, বাবা তাকে একদিন এক সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়ে টিকিটের লাইন-এ দাঁড়িয়ে। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি গরিব পরিবার। ১২ বছরের নিচে ৮টি সন্তানসহ পরিবারের অভিভাবক লাইনে দাঁড়িয়ে। পোশাক-আশাক দেখে বোঝাই যাচ্ছিলো একেবারেই গরিব তারা। কিন্তু সন্তানেরা বেশ সুন্দর স্বভাবের, আর খুব উত্তেজনায় ভুগছিল যে কখন তারা সেই সার্কাসের জোকার, পশু আর চমৎকার খেলাগুলি দেখবে। সামনে গৃহস্বামী আর স্ত্রী। স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে। কি আনন্দ তাদের আর কি সুখী তারা যেন! টিকিট কাউন্টার-এর মহিলা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কত জনের টিকিট চাই। গৃহস্বামী বললেন সংখ্যায় তারা ৮ জন। টিকিট কাউন্টার থেকে বলা হলো মোট টিকিটের দাম। শুনে তো তার স্ত্রী দুঃখে হতাশায় স্বামীর হাত ছেড়ে মাথা নিচু করে রইলো। আবার গৃহস্বামী

নীরবতা উন্নতির আদর্শ গুণ।

—ঐ

জিজ্ঞাসা করায় কাউন্টার থেকে একই উত্তর এলো। সেই শুনে গৃহস্বামী ভাবছেন কি বলবেন তার সন্তানদের, যে তার কাছে অত টাকা নেই টিকিট কেনার? এই দৃশ্য Katherine-এর বাবা দেখছিলেন। তারপর তিনি নিজের পকেট থেকে ২০ ডলার মাটিতে ফেলে দিলেন। আর তারপর বাবা মাটিতে ঝুঁকে ওই ২০ ডলার হাতে তুলে ৮ সন্তানের পিতাকে বললেন, ''মহাশয় এই যে আপনার টাকা মাটিতে পড়ে গিয়েছে।'' এই বলে তার হাতে তিনি টাকাটা তুলে দিলেন। পরিস্থিতিটা ৮ সন্তানের বাবা বুঝতে পারলেন। তিনি কারো কাছে টাকার জন্য হাত পাততে পারবেন না, তখন এইরকম সাহায্য পেয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে মেনে নিলেন। আর অশ্রুসজল চোখে তিনি টাকা হাতের মুঠোয় করে দুহাত দিয়ে Katherine-এর বাবার হাত চেপে ধরে কান্নায় বলছেন : 'আজ এই আমার কাছে আর পরিবারের কাছে অনেক, অনেক কিছু।'

Katherine-এর বাবা আর Katherine গাড়ি করে বাড়ি ফিরে এলেন সার্কাস না দেখেই। কারণ যা ছিল তা তিনি প্রায় সবটাই ওই পরিবারকে দিয়ে দিয়েছেন। সার্কাস দেখা হলো না ঠিকই কিন্তু তিনি ও তার বাবা খুব আনন্দ অনুভব করলেন যে ত্যাগের মূল্য কি। যদি বৃহৎ হতে চাও জীবনের চেয়েও (larger than life) তাহলে দিতে শেখ, ভালোবাসা বলতে এই নয় যে তুমি কিছু পাবার আশা করবে, বরং চাইবে দিতে; যা সত্যিকার সব কিছু—তিনি লিখছেন!

আসলে কি করে সুসম্পর্ক, ভালোবাসা থাকবে নিরবচ্ছিন্নভাবে? আমাদের সব কিছুর পিছনে আত্ম-অহংকার, লোভ, আসক্তি এত বেশি, আর এমনভাবে বাঁচি যেন কোনোদিন মরবো না। যা পেতে চাই, পাই তা যেন চিরকাল আমার হয়েই ভোগ করবো বা মৃত্যুর পরও সেসব ভোগ করবো। ভাবখানা এইরকম। যখন শ্রীমায়ের কাছে শুনি ''Love is not to possess but to give oneself'' অর্থাৎ ভালোবাসা মানে অধিকার করা নয় বরং আত্মদান করা। কিন্তু একথা আমাদের বাস্তব জীবনে, অনুভূতির মধ্যে, কাজের মধ্যে ধরা পড়ে না। একথা বুঝি কি, অন্যেরা ভালো না থাকলে, আলোকিত না হলে আমিও কিন্তু সুখী হতে পারবো না—কোনো না কোনোভাবে সমাজের এই অজ্ঞানতা, অভাব, অশিক্ষা আমাকে আঘাত করবেই। ভাবিনি যে আমার বেঁচে থাকার পিছনে কত শ্রমজীবী মানুষের শ্রম আছে। চাষী, জনমজুর, ট্রেন-বাস চালক, কনডাক্টর, ঝাড়ুদার, রিকশাচালক, সবজি বিক্রেতা, দুধওয়ালা, ফেরিওয়ালা—তাদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাবটি কি?

চোখের ভাষা, হৃদয়ের অনুভব, চিন্তার প্রসারতা, কাজে কর্মে প্রকাশ—কোথায় মানুষের সেই অকৃত্রিম সম্পর্ক ও ভালোবাসা আর বিশ্বাস! আদর্শের কথা সুন্দর করে বলতে গর্ব বোধ করি, শুনতে ভালোবাসি, শুনে উচ্ছ্বসিত হই। কিন্তু বাস্তব জীবনটা কেমন নিরুত্তাপ!

ঈশ্বর বিশ্বাসীরা তো বলেন সবই তিনি, সবার মধ্যেই তিনি, সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম'। তাহলে, আমরা কি?

অটল শান্তির মধ্যেই সত্যকার শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

—ঐ, পৃ ১৩২

কাজ যখন অ-কাজ, সুখ যখন অ-সুখ

অরুণবাবু দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ছিলেন। থাকতেন কলকাতা কর্মস্থল থেকে ৪০ কিমি দূরে। প্রতিদিন সাত সকালে উঠে ছোটোখাটো সংসারের কাজ করতেন। নিয়মিত বাজারে যেতেন সাইকেলে চড়ে, যদি টাটকা মাছ পাওয়া যায়। পেলে গিন্নি কোনোরকমে মাছের ঝোল, ডাল আর কখনো বা সাথে হয়তো একটা সবজি অরুণবাবুর পাতে তুলে দিতেন। একটা সময় ছিল যখন তার ঘরে গ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না। সেই কয়লা ঘুঁটে দিয়ে অরুণবাবু নিজে ভোরবেলা উঠে উনান সাজাতেন আর জ্বালানোর ব্যবস্থাটাও নিজে হাতে করতেন। তার গিন্নি উনান ধরানোর পর ঘুম থেকে উঠে চায়ের ব্যবস্থাটাও নিয়মিত করতেন। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, অফিস-এ টিফিনের জন্য কোনোদিন রুটি তরকারি বা অন্য কিছুর ব্যবস্থাটাও করে দিতেন। তারপর অরুণবাবু সাইকেলে চেপে স্টেশন, শিয়ালদহগামী ট্রেন-এ উঠে কলকাতা পৌঁছে বাদুড়ঝোলা বাসে নিয়মিত অফিস করতেন। মাস পোয়ালেই মাইনেটা এনে গিন্নির হাতে তুলে দিতেন। এই হলো অরুণবাবুর রোজগেরে জীবনের রোজনামচা। কিন্তু এই রোজনামচায় মাঝে মাঝেই অরুণবাবুর গিন্নিকে বলতে শোনা যেত, ''আর পারি না, সেই সাত সকালে ওঠো, পড়ি কি মরি করে রান্না করো, টিফিন করো সকাল আটটার মধ্যে; কবে যে রেহাই পাবো এই নিত্যকার ঝঞ্ঝাট থেকে। অবসর নিলে বাঁচি।'' হ্যাঁ, অবশেষে অরুণবাবু অবসর নিলেন। তার গিন্নি যথারীতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন: 'যাক বাবা বাঁচা গেল, আর সাত সকালে উঠে রান্না করতে হবে না।'

এই কাহিনি চাকুরিজীবী মানুষের সংসারের চেনা পরিচিত ছবি। তাতে আর বলার কি ছিল নতুন করে এখানে—এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। না, পরিচিত কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের মুখ্য দৃষ্টিভঙ্গি যা আমাদের অসুখী হবার কারণ। কারণ হলো ওই অরুণবাবুর গিন্নির মতো বিরক্তি প্রকাশ। তিনি কিন্তু ভাবলেন না যে এই জীবনের শখ, আহ্লাদ, পোশাক-আশাক, সন্তানের লেখাপড়ার ও তার যাবতীয় খরচ, বেড়াতে যাওয়া, সঞ্চয় করা, চিকিৎসার খরচ মেটানো—সবই অরুণবাবুর চাকরির দৌলতে। সেই চাকরি জীবনের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে নিয়মিত ঠিক সময়ে রান্না করে দেওয়াটা অরুণবাবুর গিন্নির কাজ ছিল। কিন্তু অরুণবাবুর গিন্নি ভাবলেন না যে ওই অর্থ উপার্জনের জন্য, জীবনধারণের জন্য, শখ আহ্লাদ মেটানোর জন্য তিনি যে কাজটা করছেন সাত সকালে উঠে তা না করলে পেটে অন্ন জুটতো না। তিনি কাজটা করলেন কিন্তু সারাজীবন বিরক্তি নিয়ে, টেনশন নিয়ে। ফলে জীবনে কাজটার মধ্যে তিনি কোনো আনন্দ, উৎসাহ, প্রেরণা পেলেন না—করে গেলেন যন্ত্রের মতো। অথচ মানুষ আনন্দের জন্য, বিলাসিতার

শান্ত নীরবতায় শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়।

—ঐ, পৃ ১৩৪

জন্য, সুখের জন্য এহেন কাজকে যথার্থ মনোভাব না নিয়ে ক'রে সুখের ও আনন্দের জন্য সিনেমা, বায়স্কোপে যান, আর হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে চর্ব্যচোষ্য খাওয়ায় কি বিপুল উৎসাহ! সঞ্চয়ে টাকা না থাকলেও ধার করে বেড়াতে যাওয়া, এমনকি সাধ্যের বাইরে কখনো ধার করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করা।

এমনকি এহেন জীবনের, এহেন নিত্য কর্ম থেকে বেরিয়ে বিলাসিতার সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ কাজকর্ম করতে গিয়েও টেনশন, অস্থিরতা, উদ্বেগ আর কাজগুলি সম্পন্ন করতে ও করাতে যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের সাথেও 'পানের থেকে চুন খসলে' বাদবিতণ্ডা, ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রকাশ করাটা এই মানুষের রোজনামচা। ফলে কোনো কাজটাই আর স্বচ্ছন্দ, আনন্দ আর সেবার মনোভাব থাকে না। ঠিক এই মনোভাব নিয়ে কাজ করলে কাজটা অকাজে পরিণত হয়—অভ্যন্তরীণ মনোভাবের দিক থেকে। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, যে কর্ম দিব্যকে নিবেদন করে করা হয় না সে কাজ অকাজ, সে কর্ম বিকর্ম। এখানে দিব্য মানে হলো পূর্ণতর এক চেতনা যা সব কিছুর মধ্যে আনন্দ, উৎসাহ ও 'সত্যম শিবম'কে উপলব্ধি করা। অতএব এইরকম ক্ষেত্রে কর্ম থেকে কর্মফল যা হয় তা হলো নেতিবাচক পরিস্থিতি। কাজ করতে গিয়ে অস্থিরতা, যথার্থ একাত্ম হয়ে মনোনিবেশ না করে কতক্ষণে তা সম্পন্ন হবে সেই চিন্তায় উদ্বেগ, বিরক্তি, অস্থিরতা। কাজ করতে করতে কাজের ফল নিয়ে দুশ্চিন্তা আসলে কাজের গুণগত মান, তার মধ্যে আনন্দ অনুভব করা, আর তার সাথে নিজের জীবনের প্রকৃতিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দিকটা একেবারেই উপেক্ষিত। ফলে এই ধরনের মানুষেরা কাজ করেও, তথাকথিত ভাষায় 'কর্মঠ' হয়েও নানা মানসিক সমস্যায় ভোগেন আর তার থেকে শারীরিক ব্যাধি। শরীরটা হলো একটা দর্পণ। সমস্ত মনোভাব থেকে তার প্রতিটি প্রতিক্রিয়া শরীরের অবস্থাকে প্রভাবিত করে। *(পরের সংখ্যায়)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিগত ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে আমাদের মাসিক মুখ পত্র প্রকাশিত হবার পর নতুন নামে ''ঊষসী'' প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করেছে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে, ২০১৭ সাল থেকে।

পাঠকদের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য আমাদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

—সম্পাদক

কথার সাহায্যে কখনো কখনো বুঝতে পারা যায়, কিন্তু একমাত্র নীরবতার মধ্যে জানতে পারা যায়।

—ঐ

Workshop and Discourse
on
"PRACTICAL SPIRITUALITY"
(in Bengali / English)
Course contents:
*** Problems of Human Relationship and Solutions * Collective living: problems & solutions * How to overcome Depressions * Right Judgment * How to shape Personality * Effective Life Management * Art of Parenting * True Leadership *How work becomes worship * Integral Healing: Psychological practices**
# Any invitation to hold the above Workshops/Discourses & interactive sessions are welcome.
Contact: 9038556509 E-Mail : sriaurobindosactionwestbengal@gmail.com

@ Conducted by : Sri Aurobindo's Action West Bengal

SECURE THE WAY TO WANT IT

OPAQUE

OPAQUE ELECTRONICS AND ELECTRICALS
1/1, Karbala Tank Lane, Kolkata–700 006, Mob : 9830450143
Manufacturer of Automatic Water Level Pump Controller ''SENSOR'' Marketing and installation of CCTV Camera with Networking, Fire Alarm System, Hydrant system, Attendance Cum Access Control System, EPABX, Public Address system etc.

শ্রীমায়ের চরণে প্রণাম—

অরবিন্দ-বুলু, রনি-রীনা

অনিন্দ্য-মনা, পম্পম-শেফালী

''The true destiny is to reach the Divine Consciousness.''
—The Mother (CWM, Vol–14, P. 43)

My Pronam to the lotus feet of the Mother
Ratna Munshi
Chandannagar, Hooghly, W.B.

''বিঘ্নের উপর হাসির সেই ফল, মেঘের উপর সূর্যকিরণের যে ফল—তারা কেটে যায়।'' —শ্রীমা

A Well-Wisher

3A, St. Georges Terrace, Kolkata-700 022

With compliments from :

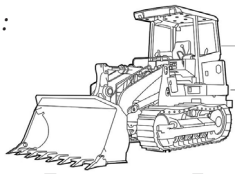

Shachindranath Mallik

Deals : Constrction & Hiring Earth Equipments

Mobile : 9932542771 / 9674372871

''সুখ জীবনের লক্ষ্য নয়—সাধারণ জীবনের লক্ষ্য আপন কর্তব্য সম্পাদন, আর অধ্যাত্মজীবনের লক্ষ্য ভগবানের উপলব্ধি।'' —শ্রীমা

চুনীলাল ভৌমিক ও পারমিতা ভৌমিক

প্রফুল্ল নগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

পিন কোড - ৭৪৩২৬৮

'মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে—তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।''

—শ্রীঅরবিন্দ (SABCL, Vol–4 P. 365)

Offering on behalf of

BABLU, RITA, ANNAPURNA & RUNA

শ্রীঅরবিন্দ অ্যাকশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাস্টের পক্ষে শ্রী সুব্রত সেন কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
অক্ষরবিন্যাসে - মেগাবাইট, ১০ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।
মুদ্রণে - গীতা প্রিন্টার্স, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।